উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের আবাসিক ছাত্রীদের অবস্থান : প্রান্তিক অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য

পি এইচ. ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

২০২৪

মধুপর্ণা কর্মকার

রেজিস্ট্রেশন নং : D -7/ISLM/13/18

তত্ত্বাবধায়ক : ড. নন্দিতা ব্যানার্জী ধাওয়ান

মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অব ইন্টারডিসিপ্লিনারী স্টাডিজ ল' এন্ড ম্যানেজেমেন্ট

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৭০০০৩২

শিরোনাম

উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের আবাসিক ছাত্রীদের অবস্থান : প্রান্তিক অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য

সূচনা

জাতিভিত্তিক বৈষম্য উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একটি জটিল সমস্যা যার দৃশ্যমানতা প্রকট না হলেও প্রভাব অনুভূত হয়। আজকের উচ্চশিক্ষা কোনো আকস্মিক প্রতিষ্ঠান নয়, একটি স্পষ্ট ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ফসল। একটি প্রতিষ্ঠান ও তৎসংলগ্ন পরিসরের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকে যার ভিত্তিতে নির্মিত ও সঞ্চারিত হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির কার্যপ্রণালী। উচ্চশিক্ষা পরিসরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়াজাত। শিক্ষানীতি সংস্কার, সাংবিধানিক অধিকার ও সংরক্ষণ, চলমান সামাজিক আন্দোলনের একটি সম্মিলিত প্রভাব পড়ে উচ্চশিক্ষার পরিসরে অথবা এই কার্যকারণ সম্পর্কে নির্মিত হয়ে চলে একটি উচ্চশিক্ষা পরিসরের চরিত্র। সামাজিক প্রতিটি স্তরগুলি যেমন প্রতিনিয়ত নিজেদের অবস্থান বদল করছে, প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে পারস্পরিক বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক। ক্ষমতা সম্পর্কের আপাত শক্তিশালী প্রভাবকগুলি ক্রমে অন্য বিষয় এবং পরিসরকে প্রভাবিত করে চলে। বিপরীতে ভিন্ন কার্যকারণ ক্ষমতা সংগ্রহ করলে পুনরায় বদলে যায় অবস্থান। প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও পরিকাঠামো এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ক্রমে বদলে যায়। একদিকে সামাজিক বৈষম্য, আর্থ-সামাজিক স্তরবিভাজন, বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক অন্যদিকে সংরক্ষণ, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদির চলমান দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরকে একটি ক্রমাগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিকাঠামোগত অন্তর্ভুক্তি অন্যদিকে বাস্তব দৈনন্দিনে তার ব্যত্যয় পরিস্থিতিকে স্ববিরোধী করে তোলে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিক ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা ও অবস্থান এই গবেষণা সন্দর্ভের অন্বিষ্ট।

পূর্ববর্তী ও বিদ্যমান সূত্র

প্রথম প্রজন্মের কলেজ ছাত্ররা ‘শিক্ষামূলক অগ্রদূত’ তারা তাদের পরিবারের প্রথম, বা প্রথমদের মধ্যে একজন যারা মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছে।(Billson and Terry, 1982; Mitchell, 1997) কিছু চিন্তাবিদ তাদের এমন ছাত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন যাদের বাবা-মা কলেজে যাননি। Billson & Terry এবং অন্যান্য গবেষকরা তাদের কাজের সংজ্ঞাটিকে এমন ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাদের বাবা-মা কলেজে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু কোনও ডিগ্রি অর্জন করেননি এবং অন্যরা তাদের গবেষণায় সংজ্ঞাটিকে সংকুচিত করেছেন এবং প্রথম প্রজন্মের ছাত্র বলতে কেবলমাত্র সেই ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা তাদের পরিবার থেকে প্রথম কলেজে গেছে। (London, 1989) কিছু গবেষক এই ধরনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভিজ্ঞতাগত পার্থক্য নিয়ে গবেষণা করেছেন, যাদের বাবা-মায়ের শুধুমাত্র উচ্চ বিদ্যালয় বা তার কম ডিগ্রি রয়েছে, বনাম এমন কিছু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, যাদের বাবা-মা কোনও কলেজে পড়েছিলেন কিন্তু ডিগ্রি পাননি এবং যে ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মা স্নাতক বা তার বেশি ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং তারা এই আলাদা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য খুঁজে পেয়েছেন (Pascarella et al. 2004; Sherlin, 2002)। এই

গবেষণায় প্রথম প্রজন্মের কলেজ ছাত্রছাত্রীদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যাদের বাবা-মা বা অভিভাবক উভয়েরই উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা বা তার কম রয়েছে এবং মাধ্যমিক পরবর্তী ডিগ্রি শুরু করেননি। এই সংজ্ঞাটি সমসাময়িক গবেষণার সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। যদিও প্রথম প্রজন্মের কলেজ ছাত্রছাত্রীর সংজ্ঞা পরিবর্তিত হতে পারে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রথম প্রজন্মের কলেজ ছাত্রছাত্রীদের খতিয়ান নেয়, তাতে দেখা যাচ্ছে, তাদের সংখ্যা ইউনাইটেড স্টেটসের কলেজ ক্যাম্পাসে বাড়ছে (Mitchell, 1997; Padron, 1992; Terenzini et al., 1996)। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজে স্থানান্তরকে বিশেষভাবে কঠিন বলে চিত্রিত করা হয়েছে (London, 1989; Terenzini et al., 1996)। টেরেঞ্জিনি (1994) এবং অন্যান্য গবেষকরা যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা কলেজের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় তাকে ‘বিচ্ছিন্নতা’ বা পারিবারিক ঐতিহ্যের লঙ্ঘন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু কলেজের অভিজ্ঞতা তাদের পরিবারের পটভূমিতে ছিল না, তাই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের অবশ্যই একটি নতুন সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, মূলত কলেজ জীবনের একাডেমিক এবং সামাজিক সংস্কৃতির সঙ্গে। প্রান্তিক ছাত্রীরা যে সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থিত তাদের জ্ঞানের সাথে উচ্চশিক্ষার সম্পর্ক বোঝার জন্য এবং কীভাবে বিভিন্ন পরিচয়ের বিভিন্ন অভিব্যক্তির সম্পর্ক, বিশেষত বর্ণের সাথে সম্পর্কিত পরিচয় যা একাডেমিক অনুশীলনের উপর প্রভাব ফেলে এই বিষয়গুলির আন্তঃসম্পর্ক বোঝার জন্য জরুরি হয়ে ওঠে (Jawitz 2012)। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মূলত পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিতে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা জাতিগত, শ্রেণিগত, লিঙ্গগত এবং ভৌগোলিক প্রান্তিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যিনি স্কুল শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হন নি বা সুযোগ পান নি, তার সন্তান যখন উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তাকে উচ্চশিক্ষা জগতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘প্রথম প্রজন্ম’ হিসাবে ধরা হয়। উচ্চশিক্ষায় ‘প্রথম প্রজন্ম’ এমন একটি শব্দ যা দ্বারা আন্তর্জাতিক ভাবে বোঝানো হয় সেইসব ছাত্রদের যাদের অভিভাবকদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিলনা। উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামোর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তাদের বেশ কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যে বিষয়টি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় আনার অন্যতম লক্ষ্য হল তাদের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষাবিদ হিসাবে যোগদানে সক্ষম করা। যারা প্রথম প্রজন্মের ছাত্র ছিল এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একাডেমিক পদে প্রবেশাধিকার অর্জন করবে। একাডেমিক অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী বা অবদানকারী হিসাবে, তারা জ্ঞান সম্প্রদায়গুলিকে বৈচিত্র্যময় করার সম্ভাবনা রাখে এবং তাদের পক্ষে যদি সমালোচনামূলক ভিত্তি অর্জন করা সম্ভব হয়, তবে এই ছাত্রছাত্রীরা সামাজিক গঠন (শিক্ষার মাধ্যমে) এবং জ্ঞান গঠন (গবেষণার মাধ্যমে) এবং পরিসরের গণতান্ত্রিককরণে অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

এরভিং গফম্যান (1961) বলছেন ‘টোটাল ইন্সটিটিউশন’ এর ধারণা। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত এই ধারণায় দেখা যাচ্ছে আবাসিকদের ওপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান একপাক্ষিক ভাবে প্রয়োগ করে। যা আবাসিকদের আত্ম সম্পর্কে ধারণাকে প্রভাবিত করে। টোটাল ইন্সটিটিউশন হিসাবে তিনি দেখছেন কারাগার, মানসিক হাসপাতাল, বোর্ডিং স্কুল ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠান গুলিতে মূলত সামাজিক ভাবে ‘ভঙ্গুর’ , ‘ভয়ংকর’

ব্যক্তিদের সংশোধনের একটি উদ্দেশ্যমূলকতা রয়েছে। এর ক্ষমতা প্রয়োগ প্রণালী একপাক্ষিক। এখানে আবাসিকদের অংশগ্রহণ নেই। গফম্যান আরো বলছেন, এই নিচ্ছিদ্র একপাক্ষিক ক্ষমতার চলনের জন্য আবাসিকদের মধ্যে প্রতিরোধ স্পৃহা তৈরি হয় এবং একটি 'প্রতিরোধী আত্ম' গড়ে ওঠে। যার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা লাগু করার প্রক্রিয়ার একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। খুব ক্ষুদ্র মাত্রায় প্রতিরোধ থেকে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ তৈরি হয় আবাসিকদের মধ্যে। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদস্যদের, আবাসিক, কর্মী, কর্তৃপক্ষের প্রতিনিয়ত পারস্পরিক যোগাযোগ, আদানপ্রদানের ভিত্তিতে আবাসিকদের 'আত্ম' -এর ধারণাটি তৈরি হয় এবং পরিবর্তিত হতে থাকে। আবাসিকদের এই 'আত্ম' এর ধারণা স্থির ধারণা নয়, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধের মাত্রা অনুসারে তা বদলায়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্র বদলে যাচ্ছে, যা পুনর্নির্মিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যেখানে কর্তৃপক্ষ এবং আবাসিকরা প্রতিনিয়ত পরস্পরকে প্রভাবিত করছে, এখানে ক্ষমতা, নির্দেশ একমুখী নয়, এখানে পরস্পরকে প্রভাবিত করার একটি অবকাশ তৈরি হয়। বিশ্ববিদ্যলয়ের হস্টেল কিভাবে এই রিইনভেন্টেড প্রতিষ্ঠানের আকার নিয়েছে, সেখানে কর্তৃপক্ষ এবং আবাসিকদের মধ্যে একটি পারস্পরিকতার জন্ম হয়, যেখানে নির্মিত 'আত্ম' এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিয়ত আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে কিভাবে নির্মিত হয়ে চলে প্রতিষ্ঠানটির চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য– এই গবেষণায় বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পুনরোন্বেষণের সুযোগ রয়েছে। এই প্রতিরোধী আত্মের সঙ্গে সংঘর্ষে তৈরি হয় ক্ষুদ্র মাত্রার প্রতিরোধ থেকে বৃহৎ আন্দোলন।

এই পুনর্নির্মিত প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে যুক্ত হয়। এই প্রতিরোধ যত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকারেই হোক না কেন, টোটাল ইন্সটিটিউশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নিয়ম নীতির বিরুদ্ধে, অবদমনের বিরুদ্ধে, পরিষেবা পাবার জন্য, একে অন্যের জন্য পাশে দাঁড়ানো, কড়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এবং নজরদারীর বিরুদ্ধে। এই প্রতিরোধ স্পৃহা তৈরি হয় আবাসজীবনে। এই প্রতিরোধ স্পৃহা মূলত আবাসজীবনে অন্যান্য আবাসিক অর্থাৎ সহ–আবাসিকদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মী, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নির্মিত হয়। অথবা এই প্রতিরোধ স্পৃহা তৈরি হয় প্রতিষ্ঠানে আসার আগে তাদের নিজস্ব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ডব্লিউ জে ফিলিপ্স তাঁর 'দি গ্রেনেডা বয়েজ সেকেন্ডারী স্কুল হস্টেল' (২০০৯)-এ বর্ণনা করছেন কিভাবে হস্টেলে রাগী, বদমেজাজী, সহবতহীন ছাত্রদের কিভাবে সংশোধন করা হত। এখানে পড়াশোনা ছাড়াও ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ তৈরির অবকাশ ছিল। বাকী ছাত্রদের থেকে হস্টেলের ছাত্ররা অপেক্ষকৃত বেশি বন্দি থাকলেও তাদের এই বন্দিত্ব বোঝার মত ছিল না, হস্টেলে তারা নিজেদের এবং সামাজিক ভাবে নিজেদের সত্তাকে উন্নত করার অবকাশ পেত। হস্টেল তাদের কাছে এনে দিত বহুবিধ সমৃদ্ধির সুযোগ।

আত্মপরিচিতির বোধ কোনো স্থির ধারণা নয়, এই হিসাবে যুক্তি দিচ্ছেন সুজি স্কট। প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রদের প্রতিনিয়ত আদানপ্রদানের মাধ্যমে আত্ম সম্বন্ধে ধারণা বদলে যেতে থাকে, এই ক্রম বিবর্তিত আত্মের ধারণার সঙ্গে বদলে যেতে থাকে ব্যক্তির আত্মপরিচিতির বোধ (Scott, 2011)। নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই আত্মের রূপান্তরের অবকাশ অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বদল হতে থাকে পারস্পরিক ভাবে। ব্যক্তিকে

একদিকে যেমন বদলে দিতে থাকে প্রতিষ্ঠান তেমনি ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সাহচর্যে ক্রমাগত বদলে যেতে থাকে প্রতিষ্ঠানের চরিত্র। কারাগার বা মেন্টাল হাসপাতালের থেকে চরিত্রগত দিক থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল। সেখানে কিভাবে পারস্পরিক প্রভাবে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে বদলের সম্ভবনা রয়েছে তা খতিয়ে দেখার অবকাশ রয়েছে এই গবেষণায়। উদাহরণ হিসাবে এখানে পিঞ্জড়া তোড় আন্দোলনের কথা বলা যায়, নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেই সম্ভবনা বা অবকাশ রয়েছে যেখানে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত বদল করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একজন আবাসিকের আত্মপরিচিতির বোধ কেন বদলে যায় এবং কিভাবে বদলে যায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির পরিকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবাসিকদের আন্তঃসম্পর্ক। বিশেষ আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে হীন আত্ম পরিচয় বা আত্ম পরিচয়হীনতা থেকে আবাসিক এবং ছাত্রী এই নতুন পরিচিতির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। ক্রমাগত নতুন আদান প্রদান থেকে নতুন আত্ম-পরিচয় লাভের সম্ভবনা তৈরি হয়। আবার, বিশেষ পরিচিতির বোধের সঙ্গে ব্যক্তি একাত্মতা বোধ করে, বাকী অনেক পরিচিতি তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সেগুলির সঙ্গে তারা ততখানি একাত্মতা বোধ করে না (Shreeya, 2018)। আবাসিকদের পরিবর্তিত আত্মবোধ যা দীর্ঘ আবাসজীবনে নির্মিত হয় তার সঙ্গে বিরোধ বাঁধে প্রান্তিক ছাত্রীটির পিছনে রেখে আসা বাস্তবতার, সে বেখাপ হয়ে পড়ে। একদিকে যেমন নবনির্মিত আত্ম একজন ছাত্রীকে করে তোলে নিজের সম্বন্ধে শক্তিশালী তেমনি নিজের সম্প্রদায়ের বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কের সঙ্গে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। বিষয়টি অন্বেষণের অবকাশ রয়েছে।

ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠান এবং সমষ্ঠির সম্বন্ধ বিষয়ে নীরা যূভাল ডেভিস (2011) ‘পলিটিক্স ওব বীলংগিং’ বইতে বিশদে আন্তঃস্তর ভিত্তিক আলোচনার বৈশিষ্ট্যের পাশপাশি ব্যক্তির সংযুক্তি এবং বিচ্ছিন্নতার বোধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কখন একজন নিজের পরিচিত এলাকা, গোষ্ঠীর বাইরে অন্যত্র বিচ্ছিন্ন বোধ করেন। নিজের পরিচিত পরিসরের বাইরে কীভাবে একজন আত্ম–পরিচিতি এবং অস্তিত্ববোধের সংকট বোধ করেন। এই বিষয়টি প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে যখন একজন দলিত ছাত্রী নিজের পরিচিত গোষ্ঠী, এলাকার বাইরে মেট্রোপলিটন সিটিতে আসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তা দেশের বাইরে না হলেও, স্থানিক, ভৌগোলিক সবদিক থেকে এতটাই আলাদা যে তাঁরা এক ধরণের বিচ্ছিন্নতা বোধ করেন, কোনো কিছুই তাদের কাছে পরিচিত হিসাবে প্রতিভাত হয় না। অস্তিত্বের সংকটের বোধ তৈরি হয়। নীরা যূভাল ডেভিস আরো বলছেন, ব্যক্তির সংযুক্তির বোধ বিভিন্ন ভাবে হতে পারে এবং বিশেষ কোনো বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা বোধের ভিত্তিতে হতে পারে। এই সংযুক্তির বোধ ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে পারে, তা স্থির কোনো ধারণা নয়। ব্যক্তির সংযুক্তির বোধ একটি স্তরীভূত ধারণা। স্থানগত, মাত্রাগত। তাঁর মতে সামাজিক, রাজনৈতিক এই সংযুক্তির বোধ বিশ্লেষণ করতে গেলে তিনটি পৃথক বিষয়কে চিহ্নিত করতে হবে যা দ্বারা সংযুক্তির বোধ নির্মিত হয়। প্রথমত, সামাজিক অবস্থান, দ্বিতীয়ত, মানুষজনের সঙ্গে পরিচিতি, সমষ্ঠি ও দলের সঙ্গে নৈকট্যের বোধ তৃতীয়ত, নৈতিক এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধ যার দ্বারা একজন নিজেদের ও অন্যদের বিচার করে (Davis, 2011) এই বিষয় গুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

ক্ষমতায়নের একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গগত অর্থ রয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিভাগের মধ্যে এবং সর্বত্র পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ককে রূপান্তরিত করে (Batiliwala 1993)। এই বিষয়ে গবেষকরা ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি তৈরি করেছেন পছন্দের কাঠামোর মধ্যে । কবীরের মতে, ক্ষমতায়ন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মহিলারা কৌশলগত জীবন বেছে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেন (Kabeer, 2001)। নারীর ক্ষমতায়ন মানে নারীদের কী বেছে নেওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা নয়, বরং বেছে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানো এবং সেই পছন্দের ফলাফল সর্বোচ্চ করে তোলার কথা বলা হয় (Kabeer 1999)। কবীর ক্ষমতায়নের তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন - সম্পদ (বস্তুগত, মানব ও সামাজিক সম্পদে প্রবেশাধিকার), কর্তৃত্ব (আলাপ-আলোচনা, নস্যাৎ করা ও প্রতিরোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া) এবং সাফল্য। (ভাল থাকার ফলাফল)। ক্ষমতায়ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে দুটি ধারণা রয়েছেঃ কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা। বাটলিওয়ালার ক্ষমতায়ন যেভাবে তত্ত্বায়িত করেছেন, তিনি সামাজিক শক্তির পরিবর্তনের সূচক হিসাবে বিষয় দেখেছেন তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত প্রক্রিয়া- মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করা; বস্তুগত, মানব ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তন; এবং প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর রূপান্তর–যেগুলির দ্বারা কিছুটা বুঝতে পারি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মতো যে কোনও সমষ্টিগত নির্মাণ প্রক্রিয়া (Batliwala, 1993)। আন্দ্রেয়া কর্নওয়ালের ভাষায় (Cornwall, 2016) ক্ষমতায়ন এমন কিছু নয় যা মহিলাদের প্রতি বা তাদের জন্য করা যায়। যখন মহিলারা তাদের 'ভিতরের শক্তি' চিনতে পারেন এবং অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে 'ক্ষমতা' প্রয়োগের জন্য একত্রিত ভাবে কাজ করেন, তখন তারা এজেন্ট হিসাবে কাজ করার 'ক্ষমতা' অর্জন করেন; যখন তারা অবিচার ও বৈষম্য মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করেন, তখন এটি ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের 'শক্তি' হয়ে ওঠে। 'ভিতরের ক্ষমতা' কেবল আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-মূল্যবোধকেই বোঝায় না, বরং নিপীড়নমূলক কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে সনাক্ত ও চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতাও বোঝায়। এটি একটি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন, যার মাধ্যমে একজন আদর্শিক স্তরে সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং সমাজে নারীদের কাজ করার সীমা ও সীমানা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

জাতিসংঘের স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলিকে প্রভাবিত করে এমন বেশ কয়েকটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে যার মধ্যে রয়েছে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করা (SDG 8), লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা (SDG ৫), এবং শান্তি ও ন্যায়বিচারের জন্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা (SDG ১৬)। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সাসটেনেবল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূল চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচিত, যেখানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক ভাবে ও নৈতিকভাবে চিন্তা করার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবা হয়। Levi and Rothstein (2018) সমালোচনামূলক-নৈতিক বিশ্লেষণ এবং সুচারু চিন্তাভাবনা প্রবর্তনের জন্য পরিবর্তনের মূল এজেন্ট হিসাবে এবং সার্বিক ভালোর জন্য সমাজের আদর্শিক রূপ গঠনে সহায়ক ভূমিকা কাঁধে নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্ভাবনা এবং দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কীভাবে সাসটেনেবল উন্নয়নে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং কীভাবে দীর্ঘমেয়াদে তাদের প্রতিশ্রুতিতে কাজ করতে হবে, এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রথমে নিজেদের দিকে তাকিয়ে কাজ শুরু

করা উচিত এবং সমালোচনামূলক-নৈতিক এজেন্ডার জন্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, নাগরিক সমাজ সংগঠন এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা উচিত, এই বিষয়ে তারা কথা বলেন। সরকারি পণ্য সরবরাহের প্রতিনিধি হিসাবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উপযুক্ত অবস্থান অর্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয় নতুন নকশার বিষয়ে সুপারিশ করা উচিত– একথা উল্লিখিত হয়। এটি আমাদের গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক লক্ষ্য।

Nair (2017) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই একটি রাজনৈতিক স্থান হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যখন ১৯২০-এর দশকে এটি 'জাতিগত পার্থক্যের শাসন' কে চ্যালেঞ্জ করে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে ওঠে। তিনি উল্লেখ করেছেন কীভাবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজন থেকে শুরু করে একটি আধুনিক আমলাতান্ত্রিক অভিজাতদের তৈরি করার কথা ছিল, তখন থেকে একটি বুদ্ধিজীবী, অভিজাতদের তৈরি করা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু সমসাময়িক সময়ে বাজারে বিদেশী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রবেশের আগে পর্যন্ত এটি বিচ্ছিন্ন এবং অভিজাত শ্রেণি গঠনের স্থান ছিল, ধনীদের জন্য স্কুল থাকলেও ধনীদের জন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। তখনও পর্যন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি এবং কম ফি-র কারণে স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে নাগালযোগ্য ছিল এবং এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গাগুলি সামাজিক বাস্তবতার সাথে যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়েছিল যা অন্য কোথাও উপলব্ধ ছিল না। (Chaudhuri, 2011) বিগত কয়েক দশকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও গঠন পরিবর্তিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, চিন্তাবিদগণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি 'সত্যিকারের গণতান্ত্রিক স্থান' হয়ে ওঠার পথে দেখেছেন, যা পিছিয়ে রাখা শ্রেণি যাদের শিক্ষার এবং বস্তুগত সম্পদ, মূলধনের অভাব রয়েছে তাদের 'সামাজিক গতিশীলতা' নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক স্থান হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করবে। ছাত্র ফেলোশিপের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার জন্য সংরক্ষণ নীতি এবং সহযোগিতা অন্তত ছাত্রদের জন্য ব্যাপককরণ এবং গণতন্ত্রীকরণের পথ প্রশস্ত করেছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত প্রধান সামাজিক গোষ্ঠীগুলির জন্য সাম্যবাদী পরিস্থিতিতে একত্রিত হওয়ার একমাত্র স্থান হয়ে উঠেছিল। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় এক ধরনের রাষ্ট্র-বাধ্যতামূলক সমতার স্থান এবং ভারতের আইনসভা, সংসদ, বিচার বিভাগ বা আমলাতন্ত্রের মতো সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অন্তর্ভুক্ত, এটি একই সাথে নতুন বৈষম্যকে তুলে ধরে, তৈরি করে এবং অগ্রভাগে রাখে (Deshpande 2016, Nair 2017)।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে সুপ্রিয়া চৌধুরী (2011),অরুণিমা (2017), জানকী নায়ার (2017) বিশদে বলেছেন। সুপ্রিয়া চৌধুরী (2011) জ্ঞানের অর্থনীতি বিষয়টিতে আলোকপাত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভূমিকা এবং প্রত্যাশিত ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় এখনো পর্যন্ত 'পাবলিক গুড' সাধারণের সম্পত্তি এবং গণতন্ত্র রক্ষার পরিসর হিসাবে পরিগণিত হয়। (Choudhury, 2011) জ্ঞানের অর্থনীতি মূলত দিকনির্দেশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত এবং প্রত্যাশিত ভূমিকার। তিনি আরো বলছেন, ধনীদের জন্য স্কুল নির্মিত হলেও এখনও অবধি আলাদা

ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয় নি। সামাজিক সাম্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার পরিসর হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসার আশঙ্কা তিনি করেছেন। জানকী নায়ার (2017) দেখেছেন জ্ঞানের অর্থনীতির আমুল বদলের সাথে সাথে ক্রমে জ্ঞান হয়ে উঠেছে পণ্য এবং নিয়ন্ত্রিত পণ্য। শিক্ষণ এবং গবেষণার পদ্ধতি বদলাতে শুরু করেছে তার হাত ধরে। বিগত কয়েক দশক ধরে এই প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর সামাজিক রূপান্তরের একটি ক্ষেত্র হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। তিনি পিছিয়ে রাখা শ্রেণির উচ্চশিক্ষায় হস্টেলের উপযোগিতার পাশাপাশি বলছেন কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভুর ভাষা শিক্ষা অনিবার্য হয়ে ওঠে। সংরক্ষণের মধ্যেও কিভাবে বৈষম্য টিকে আছে, কিভাবে ‘সংরক্ষিত’ এবং ‘অসংরক্ষিত’ আসনের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ব্যবধান টিকে আছে, এবং কিভাবে শিক্ষার মাধ্যমে এবং শিক্ষার পরিসরের মধ্যে সামাজিক সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত (Dhawan, 2022) সমাজ নির্মাণ, জ্ঞান নির্মাণ বিষয়ে ২০২০ সালে ডঃ ডিনা জোয় বেলুইজি কলকাতায় একটি বক্তৃতায় উচ্চশিক্ষার দ্বিবিধ রূপান্তর ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, সামাজিককে অবয়ব দান এবং জ্ঞান নির্মাণ। (Belluigi, 2020)

সতীশ দেশপাণ্ডে দেখেছেন কীভাবে উচ্চবর্ণের পরিচয় এমন যে ‘আধুনিক পেশাদার পরিচয়’ যা পছন্দ অনুযায়ী গৃহীত বা বর্জিত হয় বা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পুনর্লিখনযোগ্য, যেখানে নিম্নবর্ণের পরিচয় এত অবিশ্বাস্যভাবে খোদাই করা হয়েছে যে এটি অন্যান্য সমস্ত পরিচয়কে ওভাররাইট করে এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন পরিচিতির সঙ্গে একাত্মতা বিনষ্ট করে। সুতরাং, আজকের বর্ণের কেন্দ্রীয় সমস্যা হল যে এটি তথাকথিত নিম্নবর্ণের জন্য অতি-দৃশ্যমান এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের জন্য অদৃশ্য। নিম্নবর্ণের জন্য, যা জনসংখ্যার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গঠন করে, বর্ণই তাদের জন্য একমাত্র উপলব্ধ সম্পদ বলে মনে হয় যার সাহায্যে তারা এমন একটি খেলায় তাদের জীবন-সম্ভাবনা, আর্থ সামাজিক অবস্থান উন্নত করার চেষ্টা করে যেখানে খেলার মাঠ সমান নয়। এখানে বর্ণ-ভিত্তিক রাজনীতি তৈরি হয়ে যায়। অন্য অংশটি হল উচ্চবর্ণ এবং যা অনেক কম সংখ্যক এবং তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সমজাতীয়, তাদের বর্ণের অবস্থান ইতিমধ্যে এমন একটি সিঁড়ি তৈরি করেছে যা এখন নিরাপদে উৎখাত করা যেতে পারে। ঐতিহ্যবাহী বর্ণকে পুঁজি করে এবং এটিকে সম্পত্তির মতো আধুনিক মূলধন, উচ্চশিক্ষাগত যোগ্যতা এবং লাভজনক পেশাগুলির শক্ত ঘাঁটিগুলিতে রূপান্তরিত করে, এই অংশটি আজ নিজেকে ‘বর্ণহীন’ বলে মনে করে।

যাইহোক, মণ্ডল-পরবর্তী পর্যায় প্রমাণ করে যে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির বর্ণ-চেতনা থেকে স্ব-অনুভূত উত্তরণ ছিল বিভ্রান্তিকর। ‘দ্বিতীয় গণতান্ত্রিক উত্থান’ এই উচ্চবর্ণ শ্রেণিকে তাদের সুযোগ-সুবিধা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। যদিও তাদের কাছে নিম্নবর্ণের বিভিন্ন অংশের প্রবেশের জন্য স্থান তৈরি করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না, হিন্দু উচ্চবর্ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির বড় অংশ নিম্নবর্ণের উত্থানের প্রতিক্রিয়ায় অভিজাত বিদ্রোহে জড়িত ছিল এবং বর্ণ-ভিত্তিক সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছিল (Krishnan, 2017; Upadhya 2016; Fernandes and Heller, 2006; Corbridge and Harriss 2000)। শেঠ (1999) এই প্রক্রিয়াটিকে ‘বর্ণের শ্রেণীবিভাগ’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যেখানে বর্ণ নতুন

অর্থনৈতিক আগ্রহ এবং একটি রাজনৈতিক পরিচয় অর্জন করেছে। এর সদস্যরা এখন বৃহত্তর এবং একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের মালিক। ফলস্বরূপ, নতুন আর্থ-সামাজিক গঠনগুলি যেমন 'উচ্চ বর্ণ' , অনগ্রসর বর্ণ (ওবিসি), দলিত বা এসসি এবং উপজাতি বা এসটি সমাজের সম্পদ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল, ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক গতিশীলতার ধারণা সহ সমস্ত বর্ণের মানুষকে সম্মিলিতভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে অনুপ্রাণিত করার মধ্যমে। উচ্চবর্ণগুলি তাদের ঐতিহ্যবাহী উচ্চতর মর্যাদার সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উপকৃত হয়েছিল, নিম্নবর্ণগুলি ইতিবাচক পদক্ষেপের রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে তাদের সুবিধা অর্জন করেছিল, যার ফলে পুরানো মর্যাদা ব্যবস্থা এবং নতুন ক্ষমতা ব্যবস্থার মধ্যে এক ধরনের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

১৯৯১ এর দশকে যে পদক্ষেপ 'রাজনীতির মণ্ডলীকরণ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে, তা ভারতের রাজনীতির সামাজিক ভিত্তিকে আমুল পরিবর্তন করে দেয়। নতুন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান উপলব্ধি করার জন্য নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ হিসাবে সংরক্ষণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব সহ এসসি এবং এসটি-র সমন্বয়ে বিদ্যমান সংরক্ষিত বিভাগগুলিতে ওবিসি-র বিভাগ যুক্ত করা হয়েছিল। মণ্ডল কমিশন প্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে অসংরক্ষিত 'সাধারণ ' বিভাগের (General category) কল্পকাহিনী 'সর্বজনীন বিভাগ' হিসাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পরিবর্তে, সাধারণ বিভাগটি ভারতীয় জনসংখ্যার সংখ্যালঘু অংশ গঠনকারী সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চ বর্ণের জন্য একটি অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে (Deshpande, 2013)। সরকারি চাকরি ও কেন্দ্রীয় পরিষেবায় নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি কোটা ব্যবস্থা রূপায়ণের উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত অনগ্রসর বর্ণের নিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং 'অগ্রগামী' উচ্চবর্ণের লোকদের অনুপাত অনিবার্যভাবে হ্রাস করা। এইভাবে, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলির প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে 'অচিহ্নিত বর্ণহীন' ছাত্রীদের তীব্র প্রতিবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা কিছু ক্ষেত্রে প্ল্যাকার্ড ধরেছিল যার উপর লেখা ছিল "আমরা বেকার স্বামী চাই না" (Chakravarti, 2002, p. 1)। এর অর্থ ছিল যে, উচ্চবর্ণের মেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগকে প্রতিফলিত করে প্ল্যাকার্ডগুলিতে বার্তা সহ বর্ণ ব্যবস্থার পুনরুৎপাদন হিসাবে এন্ডোগামি একটি প্রভাবশালী নিয়ম হিসাবে অব্যাহত ছিল। যা সম্ভবত উচ্চবর্ণের ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবায় যুক্ত (আইএএস) স্বামীদের থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যে বিরূপভাবে প্রভাবিত হবে। এটা অকল্পনীয় ছিল যে, পিছিয়ে পড়া বর্ণের যারা সংরক্ষণের কারণে এই সুবিধাপ্রাপ্ত চাকরিগুলি দখল করবে, তারা এই যুবতী মহিলাদের সম্ভাব্য স্বামী হওয়ার জন্য বর্ণের অলঙ্ঘনীয় বাধা অতিক্রম করবে (Chakravarti, 2002; Dhareshwar, 1993)।শিক্ষা বিষয়ে এই অসাম্যের পটভূমিতে প্রান্তিক ছাত্রীরা শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করে দৃশ্যমান হয়ে উঠছেন অথবা এই দ্বিমাত্রিক ভূমিকায় অংশ হয়ে ঊঠতে পারছেন কিনা এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন তারা হচ্ছেন এটি আলোচনা করা বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের লক্ষ্য।

যাবতীয় সচেতনতা, চর্চার পরেও দেখা যাচ্ছে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য টিকে আছে, চুনি কোটাল, রোহিত ভেমুলাদের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে ক্রমাগত অথবা নৈঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে আরো বহু ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে

উচ্চশিক্ষাকালে প্রান্তিক ছাত্রীরা কি ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছন, এখনও কি ধরণের সমস্যা তাদের তাড়িত করে, যেগুলি হারিয়ে যাচ্ছে নৈঃশব্দের ঘন অন্ধকারে? তাদের অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব কি, তাদের কি একটি ভিন্ন চেতনা জগত আছে, কীভাবে তাদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনালোকিত দিককে চিহ্নিত করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শিক্ষার বাইরে স্বদেশী শিক্ষার পুনর্গঠন কি সমাজের সব স্তরের ছাত্রছাত্রীদের স্বর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল? দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সংরক্ষণ, শিক্ষানীতি সংস্কার, পলিশি নির্মাণ কি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক পরিসর গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে? ছাত্রীদের পরিবার, সমাজ, যাত্রাপথ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সময় যাপন ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রান্তিক ছাত্রীদের বর্তমান অবস্থান– এই গবেষণার অন্বিষ্ট।

গবেষণার মূল প্রশ্ন

১। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক আবাসিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার বয়ান নির্মাণে আর্থ-সামাজিক অবস্থান কিভাবে ক্রিয়াশীল থাকে?

২। পরিবারের বাইরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হস্টেল কিভাবে স্বতন্ত্র পরিসর হিসাবে প্রান্তিক ছাত্রীদের বাস্তবতাকে আকার দেয়?

৩। সাংবিধানিক অধিকার সুত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রান্তিক ছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবং দৃশ্যমানতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকাঠামো এবং উচ্চশিক্ষার পরিসরে কি ধরনের পারস্পরিক প্রভাব তৈরি করে?

৪। স্ত্রীশিক্ষার সূচনা কালে উচ্চবর্গীয় নারীর আবাসজীবনের স্মৃতিকথা এবং সমসাময়িক হস্টেল জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীর আত্মবোধের আন্তঃস্তরবিন্যাস ভিত্তিক পাঠ কিভাবে ভিন্ন?

এই চারটি প্রশ্নের অভিমুখে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি

নারীবাদী তাত্ত্বিক অবস্থান এবং দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত অবস্থান থেকে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। কোন দৃষ্টিকো্ণ থেকে দেখা হচ্ছে কোনো বিষয় তার উপর নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের ফলাফল। প্রচলিত পর্যবেক্ষণের রীতি পিতৃতান্ত্রিক, পরিস্থিতির যা ব্যাখ্যা দেয় তাতে অসংবেদনশীলতা এবং একপেশে পক্ষপাত উল্লেখযোগ্য ভাবে বর্তমান। নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে তার অভিজ্ঞতার কথা তার বয়ানে শুনলে উপলব্ধ হয় প্রচলিত বয়ানের সঙ্গে তার পার্থক্য। নারীবাদী অবস্থান বিষয়ের একটি অশ্রুত স্বরকে প্রতিষ্ঠা দেয়। অবদমনের ভিন্ন মাত্রা অনুভূত হয় ভুক্তভোগীর কাছ থেকে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনলে। এদিক থেকে নারীবাদী গবেষণা পদ্ধতি নারীর অভিজ্ঞতাকে দিয়েছে একটি বিশেষ জায়গা যেখানে প্রচলিত আরোপিত ক্ষমতাশালী স্বরের প্রতাপ থেকে স্বতন্ত্র ভাবে নারীর স্বর উঠে আসে তার নিজস্বতা ও বিশেষত্ব সমেত। প্রথমত, এই গবেষণায় নারীর অভিজ্ঞতা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সমাজে নারী একমাত্রিক কোনো গোত্র নয়। শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, বয়স, ইত্যাদি অনুসারে বদলে যায় তাদের বাস্তবতা ও বিদ্যমান ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। ফলত বদলে যায়, তাদের অভিজ্ঞতার বয়ান। তাই, উল্লেখযোগ্যভাবে এই গবেষণার দৃষ্টিও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ। নারীবাদ যদি সামাজিক ও শৃঙ্খলামূলক

নিয়ম ও সীমানাকে চ্যালেঞ্জ করে থাকে, একাডেমিতে থাকার এবং জানার নতুন উপায় নিয়ে আসে, তবে এটি তার নিজস্ব আধিপত্যবাদী সংস্করণ তৈরি ও স্থায়ী করেছে, গেটকিপিং, 'অপর' বানিয়ে তোলা, নীরবতা, উপেক্ষা এবং/অথবা আমাদের বহু অভিজ্ঞতাকে মুছে ফেলেছে। Govinda et al. (2020) দেখিয়েছেন যে, প্রতিটি ভিন্ন অবস্থানের নারী ভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন এবং তার অভিজ্ঞতার ন্যারেটিভটিও বদলে যায় তার অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। তাই সামাজিক গবেষণায় এই আন্তঃস্তর ভিত্তিক আলোচনা জরুরি অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার বৈচিত্র্য উঠে আসার জন্য। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রী যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন তাদের বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতা অনুধাবন করার জন্য নারীবাদী আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক আলোচনা যথোপযুক্ত হবে বলে মনে হয়েছে। এই আলোচনা পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সম্ভবনা রয়েছে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে কোনো বিষয়ের একটি জটিলায়িত বিশ্লেষণ গড়ে তোলার।

উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের পাশাপাশি বাংলা কথা সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হয়ে চলেছে ধারাবাহিক ভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পরিসরে সামাজিক বিভিন্ন স্তরের নারীদের অংশগ্রহণ কিভাবে সাহিত্যে উপস্থাপিত হয়েছে– এই গবেষণায় বিষয়টি দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি পূর্ণ ছবি অনুধাবনের জন্য সাক্ষাৎকার ভিত্তিক গবেষণার পাশাপাশি সাহিত্যে উপস্থাপনটি দেখা জরুরি। যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় বিশেষ স্বর গুরুত্ব পায় এবং ভিন্ন স্বর নৈঃশব্দে ডুবে যায় তার ছাপ সমাজে এবং সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে চলে সমান্তরালে। তাই সাক্ষাৎকার ভিত্তিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সাহিত্যে একই বিষয়ের উপস্থাপন এখানে অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে আবাসজীবন কেন্দ্রিক সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রেও নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি এবং আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। এই আলোচনা পদ্ধতি একদিকে যেমন লিঙ্গবৈষম্যের দিকটি চিহ্নিত করে তেমনি সামাজিক আন্তঃস্তর বিভাজনের দিকটিও তুলে আনে। নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্য আলোচনার একটি ধারা হিসাবে গড়ে উঠেছে যেখানে নারীর স্বর ভিন্নতা এবং স্বাতন্ত্র্যসহ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বিশেষত নারীর স্মৃতিকথা, আত্মজীবনীর বিশেষত্ব চর্চা এই ধারায় উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিয়েছে। নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি সাহিত্য আলোচনার মধ্যে ক্ষমতা কাঠামোর উপস্থাপনকে প্রশ্ন করে এবং ভিন্ন স্বরের প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেয়। শেষ অধ্যায়ে দুটি উপন্যাসের পাশাপাশি চারটি স্মৃতিকথা আলোচিত হয়েছে।

নারীবাদী গবেষণা যেহেতু গবেষকের অবস্থানকে গুরুত্ব দেয় এবং অবস্থানগত দৃষ্টিকোণের গুরুত্বকে স্বীকার করে সেক্ষেত্রে গবেষকের ব্যক্তিগত আত্মবোধ এবং যাত্রাপথটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি সাংবিধানিক তালিকা অনুসারে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পরিবার থেকে প্রথম উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় যোগ দিয়ে উচ্চশিক্ষার যাত্রা সচল রেখেছি। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় নিয়োজিত হয়েছি। জাতিগত, শ্রেণিগত এবং সাংস্কৃতিক মূলধন ভিত্তিক অবস্থান একজন ছাত্রীকে কিভাবে প্রভাবিত করে তার সঙ্গে একটি ঘনিষ্ট বাস্তবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক যোগ রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এই বিষয়ে গবেষণা করার

অনুসন্ধিৎসা তৈরি হয় নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে। রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ব্যক্তিগত যাত্রা অনুধাবনের ইচ্ছা তৈরি হয়। নারীবাদী গবেষণা গবেষণার অন্তিম ফলাফলের মতই সমান গুরুত্ব দেয় গবেষণার প্রক্রিয়াটিকে যেখানে মূলত গবেষণাটি 'হয়ে ওঠে' এবং এই গবেষণাগুলি যেহেতু গবেষকের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমান গুরুত্ব দেয় সামষ্টিক ভাবে গবেষণাটির নির্মাণ পদ্ধতিকে যেখানে গবেষক অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতায় এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে কাজটি সম্পন্ন করেন। মানবীবিদ্যা গবেষণার ভিতরে এই সামষ্টিক নির্মাণ এবং জ্ঞাননির্মাণের যৌথতাকে গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রেও অংশগ্রহণকারীদের দীর্ঘসময়ের সংযুক্তি এবং একাত্মতা গবেষণাটিকে চালিত করেছে। এই গবেষণাটি একটি যৌথ জ্ঞাননির্মাণের প্রচেষ্টা হিসাবে উল্লেখ করছি। মোট ছয়টি পর্যায়ে আমি নিজে এবং অংশগ্রহণকারীরা একটি মানসিক যৌথ প্রক্রিয়ার মধ্যে যাপন করেছি যার ফলাফল স্বরূপ এই গবেষণা সন্দর্ভ একটি আকার পেয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের জীবন, আত্মোপলব্ধি, আত্মজিজ্ঞাসার একটি স্রোতের মধ্যে থেকেছেন এবং তাদের কথা তাদের ভাষায় বলেছেন। নারীবাদী গবেষণা যে নৈতিক অবস্থান এবং নিজস্ব জটিলায়িত রাজনীতি নিজের মধ্যে ধারণ করে তার বিশেষত্ব হল, অংশগ্রহণকারীদের স্বরের প্রকৃতরূপের (উপ)স্থাপন।

গবেষণার পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে গুণগত পদ্ধতি। গুণগত পদ্ধতির মধ্যে লাইফ হিস্ট্রী প্রকরণ ব্যবহৃত হয়েছে নমুনা সংগ্রহের জন্য। লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চ প্রকরণ হিসাবে গ্রহণের প্রাথমিক কারণ, এই প্রকরণে একজন ব্যক্তির জীবন ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব। একজন ব্যক্তির কাছে কয়েকবার বিভিন্ন সময়ে বা কিছু সময় অন্তর ফিরে গিয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, এই পদ্ধতিতে। সেক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী তাঁর বক্তব্য, অনুভূতি সুবিন্যস্ত ভাবে প্রকাশ করার অবকাশ পান। অংশগ্রহণকারীর দৈনন্দিন জীবন, কর্মব্যস্ততা পর্যবেক্ষণ করে তাঁর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সম্ভব হয়। লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চ একজন ব্যক্তির সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য এবং পর্যবেক্ষণের অবকাশ দেয় যা গবেষণার মূল উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের সামগ্রিক শিক্ষাজীবনের চিত্র তুলে আনার জন্য লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চ উপযুক্ত হবে বলে মনে হয়েছে। প্রতিষ্ঠান অন্তস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তির আত্মের ধারণা পাঠের জন্য মূলত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি ইত্যাদি মেথড ব্যবহৃত হয়, তুলনামূলক ভাবে কম ব্যবহৃত আরো একটি মেথড হল এই লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চ বা ব্যক্তির জীবন–ইতিহাস প্রকরণ যেখানে ব্যক্তির জীবন গভীর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠ করা সম্ভব হয়। এখানে ব্যক্তির ব্যক্তিগত, নিজস্ব এবং জীবনীভিত্তিক বিষয়গুলিতে বিশেষ মনোযোগ দেবার অবকাশ তৈরি হয়। জীবনীর সঙ্গে ইতিহাস এবং সামাজিক বাস্তবতার একটি সাযুজ্য তৈরি হয় (Harrison,2009)। বিষয়ের সামাজিক পরিস্থিতির সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি তাদের ঐতিহাসিক ভাবে অবস্থান এখানে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় (Shreeya, 2018)। ব্যক্তির আত্ম এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক একদিকে যেমন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার থেকে উঠে আসে তেমনি উঠে আসে জীবনী, আত্মজীবনী এবং স্মৃতিকথায়। এইগুলি থেকে বোঝা যায় 'আত্মপরিচিতি আদতে একটি প্রবহমান ধারণা', 'হয়ে ওঠার ক্রমাগত এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া' (Scott, 2011) কীভাবে ব্যক্তির আচরণের নির্মাণ এবং ব্যাখ্যা তৈরি হবে বা পাঠ নেওয়া হবে, জীবন-ইতিহাস পদ্ধতি এখানে ব্যক্তির

প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাশ দেয় যা দেখায় কীভাবে প্রতিষ্ঠানের ভিতর ব্যক্তির অবস্থান একটি বৃহৎ পটভূমি তৈরি করে যা ব্যক্তির আত্ম-পরিচিতি নির্মাণ আত্মবোধের বিবর্তনকে সূচিত করে।

এই গবেষণায় মূলত অন্বিষ্ট একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয়, হস্টেল) ব্যক্তির "আত্ম" এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের জটিল দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ। টোটাল ইন্সটিটিউশন সম্পর্কে বহুল সমাজতাত্ত্বিক কাজ হয়েছে, গফম্যান 'অ্যাসাইলাম' (Goffman,1961) এ টোটাল ইন্সটিটিউশনকে তত্ত্বায়িত করেছিলেন, এথনোগ্রাফিক বর্ণনার দ্বারা ওয়াশিংটনে একটি মেন্টাল হাসপাতালে পাঠ নিয়ে। গফম্যান এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, টোটাল ইন্সটিটিউশন এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে সদস্যরা দীর্ঘসময়ের জন্য বন্দী থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্যই হল সদস্যদের আত্ম-পরিচিতি বদলে ফেলা (Scott, 2011)। এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রবণতাই হল, প্রাতিষ্ঠানিক একাগ্রতা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখে এবং আবাসিকদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে (Smith, 2006)। এখানে আবাসিকরা নিয়ম মেনে নেয় অথবা প্রতিরোধের রাস্তা খোঁজে। পরবর্তীতে পুনর্নির্মিত প্রতিষ্ঠান বা রিইনভেন্টেড প্রতিষ্ঠানের ধারণা তৈরি হয়। যেখানে এই একপাক্ষিক নির্দেশ পালনের কাঠামো আর ক্রিয়াশীল থাকছে না, এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক আদানপ্রদান যার ফলে দুটি পক্ষই বিবর্তিত হচ্ছে (Scott, 2011)। বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল এই নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচিত হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানে আবাসিকদের নবনির্মিত আত্মের সঙ্গে ক্রমপরিবর্তিত প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক এবং পারস্পরিকতা প্রভাব লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চে উঠে আসার সম্ভবনা রয়েছে। এই গবেষণায় লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের প্রত্যেকের বয়ান আলাদা। সমাজের সমস্ত নারীকে যেমন এক পঙক্তিতে আলোচনা করা যায় না। আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক অক্ষিকাঁচ বা ইন্টারসেকশনাল লেন্স দিয়ে দেখলে যেমন সামাজিক ছবিগুলো উঠে আসে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবে তেমনি সেখানেও কোন সাধারণীকরণ সম্ভব নয়। প্রতি জনের আলাদা অভিজ্ঞতা, আলাদা বয়ান। মাইক্রো ইন্টারশেকশনাল লেন্স ব্যবহার করলে আরো অনেক বৈচিত্র্য উঠে আসে। লাইফ হিস্ট্রী স্টাডি সেখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকে নিজেদের মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাদের এই অভিজ্ঞতার বয়ান কার্যকারণ ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে এই গবেষণায়। লাইফ হিস্ট্রি রিসার্চে স্মৃতিকথার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। স্মৃতিকথার বয়ান একদিকে যেমন ব্যক্তির আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে তেমনি ক্রম রূপান্তরিত আত্মের বিবর্তন এখানে সূচিত করা সম্ভব হয়। লাইফ হিস্টি রিসার্চে স্মৃতিকথা একটি বিশেষ অবকাশের সম্ভবনা তৈরি করে। একদিকে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক ছাত্রীদের বয়ান এবং স্মৃতিকথার ভিত্তিতে ন্যারেটিভ থেকে গবেষণার মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে

গবেষণার ক্ষেত্র ও নমুনা সংগ্রহ

পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়-বিশ্বভারতী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষনার ক্ষেত্র। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়জন করে মোট বারোজন প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক আবাসিক ছাত্রীর ছটি পর্যায়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক বা পারপাসিভ নমুণা সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও দুটি প্রতিষ্ঠানের

চারজন করে মোট আটজন অধ্যাপক এবং দুই জন করে মোট চারজন হস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুটি প্রকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, ব্যক্তিগত ও সাধারণ তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নাবলী পূরণ করানো হয়েছে। এবং অংশগ্রহণকারীদের বাস্তবতা অনুধাবন করার জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ছটি পর্যায়ে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লাইফ হিস্ট্রী রিসার্চ মেথডটি প্রয়োগ করা হয়েছে। নমুনা সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি বা পারপাসিভ স্যাম্পেলিং পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে অন্বিষ্ট বিষয়ের লক্ষ্যে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই নমুনা সংগ্রহ করা হয়। উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক এবং আবাসিক ছাত্রীদের অবস্থান নির্ণয় যেহেতু এই গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় তাই নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত এবং সাপেক্ষতা বজায় রাখতে হয়েছে। যাতে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রী যিনি প্রান্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন, একই সঙ্গে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন– এই বিষয়গুলির সাপেক্ষতা পূর্ণ হয়। উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ দিকের বাস্তবতা এবং পরিস্থিতি অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে পারপাসিভ স্যাম্পেলিং উপযুক্ত হবে বলে মনে হয়েছে। নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক (Reserved Category) এবং আর্থ-সামাজিক এই দুই দিক থেকে প্রান্তিকতাকে দেখা হয়েছে।

হস্টেলজীবন বিষয়ে বাংলা কথা সাহিত্যের যে ধারা নির্মিত হয়ে চলেছে তার মধ্যে সামাজিক বিভিন্ন স্তরের ‘শিক্ষিত’ এবং ‘আবাসিক’ নারীর স্বরের উপস্থাপন এবং প্রান্তিক স্বরের শূন্যতা কয়েকটি টেক্সটের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের সূচনাকালে যা উচ্চবিত্ত নারীরা হস্টেলে থেকে উচ্চশিক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন তার মধ্যে দুটো স্মৃতিকথা, রমা চক্রবর্তীর ‘ভরা থাক স্মৃতিসুধায়’, রাণী চন্দের ‘সব হতে আপন’ এবং সমসাময়িক স্মৃতিকথা অহনা বিশ্বাসের ‘মেয়েদের হস্টেলজীবন; অন্দরের কথামালা’, ঋতা বসুর ‘শ্রীসদনের শ্রীমতীরা’ - এই দুটি স্মৃতিকথার আন্তঃস্তর বিন্যাস ভিত্তিক নারীবাদী সমালোচনা করা হয়েছে। এই দুই সময়কালের স্মৃতিকথার মধ্যে ‘শিক্ষিত’, ‘আবাসিক’ নারীর স্বরের ভিন্ন উপস্থাপন আলোচনার সঙ্গে কথা-সাহিত্যের আরো একটি ধারা উপন্যাসের দুটি টেক্সট অহনা বিশ্বাসের ‘আরশি নগর, তিলোত্তমা মজুমদারের ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ -এর নারীবাদী আন্তঃস্তরবিন্যাস ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় অংশ নিয়ে সমাজের বিচিত্র স্তরের নারীরা এবং বিশেষত প্রান্তিক ছাত্রীরা আবাসজীবনের শরিক হচ্ছেন, তার ছাপ ধারাবাহিকভাবে কিভাবে বাংলা কথা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে এই ছয়টি রচনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

বিষয়টি আলোচনার জন্য গবেষণা সন্দর্ভটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে।

ভূমিকা - গবেষণার বিষয় এবং পটভূমি এই অধ্যায়ের উপজীব্য। ভূমিকা অংশটি পাঁচটি উপবিভাগে পরিকল্পিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিকতার বহুমাত্রা এবং ‘প্রথম প্রজন্ম’ বিষয়টি আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট

বিষয়ের বিদ্যমান ও পূর্ববর্তী সূত্র (লিটেরেচার রিভিউ), অতঃপর, এই গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এই অংশে মূলত গবেষণার বিষয়টির প্রেক্ষাপট এবং বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার কারণ আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি ও প্রকরণ আলোচিত হয়েছে। গবেষণার জন্য গৃহীত লাইফ হিস্ট্রি মেথডের উপযোগিতা আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে, এই গবেষণা উপস্থাপনের জন্য সন্দর্ভটি কি কি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম "স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনকালে সামাজিক ন্যায় ও লিঙ্গসাম্য; বিশ্বভারতী এবং যাদবপুর বিশ্ববদ্যালয়ের সূচনাপর্ব" । এই অধ্যায়ে মূলত এই গবেষণার প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের পরবর্তীকালে স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠনকালে সংশ্লিষ্ট দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ এবং সঞ্চারের ইতিবৃত্ত এই অধ্যায়ের মূখ্য বিষয়। রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তা প্রসূত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বদেশী শিক্ষার পুনর্নির্মাণে সহায়ক হয়ে ওঠা এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে বিশ্বভারতীতে নারী শিক্ষার নান্দীপাঠ - এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, আলোচিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের পরবর্তীকালে জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠন। দ্বিতীয়ত, বর্ণিত হয়েছে কিভাবে ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও ভাবনাচিন্তা, বিশ্বভারতী নির্মাণ, যা সমান্তরালে স্বদেশী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন করেছিল। তৃতীয়ত, বিশ্লেষিত হয়েছে কিভাবে বিশ্বভারতীতে নারীর উচ্চশিক্ষা ও মেয়েদের প্রথম হস্টেল 'শ্রীসদন' নির্মাণ স্বদেশী নারী শিক্ষাকে একটি বিশেষ রূপ দিয়েছিল। পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে কিভাবে পরাধীন ভারত থেকে স্বদেশী শিক্ষাচিন্তার সূত্র জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হবার পর ভারতীয় শিক্ষাচিন্তাবিদদের অক্লান্ত বৌদ্ধিক শ্রমে শেষ অবধি অবয়ব পেয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের মাধ্যমে। এই অধ্যায়ে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে জাতির সমৃদ্ধির জন্য স্বদেশী শিক্ষার পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্র হিসাবে আলোচ্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়ে ওঠার পটভূমি এবং এই পরিসরে নিম্নবর্গের নারীর প্রবেশের প্রেক্ষাপট বিধৃত হয়েছে।

এই অধ্যায়ের মূল যুক্তি ক্রম হল, প্রথমত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে দেশীয় শিক্ষার নির্মাণ, স্বদেশি শিক্ষার পুনর্গঠন, সংরক্ষণ, পলিশি সংস্কার ইত্যাদির পরেও 'পুনর্গঠন' এবং 'সংস্কার' এর পরবর্তী পর্বে 'রূপান্তর' এর মাধ্যমে প্রান্তিক স্বরের প্রতিষ্ঠা পাবার সম্ভবনা তৈরি হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক শিক্ষার ক্ষমতাতন্ত্র থেকে বেরিয়ে এলেও এদেশের বর্ণাশ্রমকেন্দ্রিক ক্ষমতাতন্ত্রের সঙ্গে কীভাবে সমঝোতা করেছিল এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়, যার ছাপ বর্তমানে তাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম "গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সার্বিক তথ্যের রেখাচিত্র" । এই অধ্যায় মূলত সংগৃহীত নমুনার পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ। যে তথ্যগুলি একজন অংশগ্রহণকারীর আর্থ–সামাজিক অবস্থান ও গড়ে ওঠা চিহ্নিত করে এবং একজন ব্যক্তি হিসাবে বুঝতে সহায়তা করে, আটটি তালিকায় তিনটি পর্যায়ে তথ্যগুলি পরিবেশিত হয়েছে - সাধারন তথ্য, পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কেন্দ্রিক তথ্য, বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেল সংক্রান্ত তথ্য। অধ্যায়টি গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের জনতাত্ত্বিক, সামাজিক এবং শিক্ষামূলক

তথ্যের উপর আলোকপাত করেছে। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীদের সামগ্রিক পরিচিতির জন্য একটি বৃহত্তর কাঠামো দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, বহুমাত্রিক পরিচিতি এবং ক্রম পরিবর্তনশীল আত্মবোধের মধ্যে প্রান্তিক একজন ছাত্রীর অবস্থান সূচিত হয়। পরিবারে গার্হস্থ্য হিংসা, লিঙ্গ বৈষম্য, বিবাহের চাপ, পড়াশোনার জন্য উপযোগী পরিবেশ এবং পরিষেবার অভাব তাদের মানসজগতকে প্রভাবিত করেছে অন্যদিকে পিছিয়ে পড়া সামাজিক অবস্থান, আর্থিক সমস্যা, ভাষাগত সমস্যা উচ্চশিক্ষায় একটি সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সাধারণ তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নতালিকা থেকে যে তথ্যগুলি উঠে এসেছে তার ভিত্তিতে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং পারিবারিক পরিস্থিতি সুস্পষ্ট। তাদের বহুমাত্রিক প্রান্তিকতা যা তাদের পরিবার, সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গ পরিচয়, জাতিগত পরিচয়, আর্থিক অবস্থান, ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থান ইত্যাদির দ্বারা নির্মিত। এই প্রান্তিকতার বহুমাত্রা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সাক্ষাৎকারে সংগৃহীত হয়েছে। এই তথ্যগুলি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম "উচ্চশিক্ষায় প্রথম প্রজন্মের আবাসিক ছাত্রীদের অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব এবং নবনির্মিত আত্মবোধের বিন্যাস" । অধ্যায়ে পরিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়া পর্যন্ত প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা কি ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন, আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়টি ছয়টি ভাগে পরিকল্পিত হয়েছে। নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক স্তরে পরিবারের মধ্যে একজন ব্যক্তি হিসাবে এই ছাত্রীরা কিভাবে বেড়ে ওঠেন, কি ধরনের সমস্যা এবং সংকটের সম্মুখীন হন, সংশ্লিষ্ট সমাজে, পাড়ায়, পরিবারে তাদের লিঙ্গবৈষম্যের অভিজ্ঞতা এবং নিজের এলাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা সূত্রে তাদের স্থানান্তরের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী অংশে পরিবার এবং হস্টেল পরিসর হিসাবে এই ছাত্রীদের জীবনে, মানসে কি ধরনের প্রভাব ফেলে, তাদের লক্ষ্য ও সম্ভবনা পূরণে এই পরিসর কিভাবে সহযোগী ভূমিকা নেয় এবং আবাসিক পরিসর কিভাবে তাদের নিজস্ব পরিসর হয়ে উঠেছে বিশ্লেষিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার পরিসরে তাদের নবনির্মিত আত্মবোধের তৈরি হয়ে ওঠা এবং তৎসম্পর্কিত সংকট আলোচিত হয়েছে। সাংবিধানিক সংরক্ষণের হাত ধরে 'প্রদত্ত বাস্তবতা' থেকে কিভাবে উচ্চশিক্ষার হাত ধরে এই ছাত্রীরা 'অর্জিত বাস্তবতা ' র স্বপ্ন দেখে মূলত এই বিষয়টি তৃতীয় অধ্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কয়েকটি বিষয়ের আলোকে আলোচিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ের মূল যুক্তি পরম্পরা হল, প্রাপ্ত বাস্তবতা থেকে অর্জিত বাস্তবতার যে আশ্বাস 'উচ্চশিক্ষা ' য় দেওয়া হয়– তার মধ্যবর্তী ব্যবধান এবং আশাভঙ্গ দুই এর মাধ্যমে নির্মিত হয় প্রান্তিক ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার যাত্রা এবং অভিজ্ঞতার বুনট। সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান, পরিসরগুলির সঙ্গে একজন প্রান্তিক ছাত্রীর সম্বন্ধ লিঙ্গগত এবং জাতিগত ক্ষমতা সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রান্তিক ছাত্রীর উচ্চশিক্ষায় অংশ নেওয়া সেই বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ককে আন্দোলিত করে এবং সম্পর্কের সমীকরণটির তৃতীয় মাত্রার জন্ম দেয়। নব নির্মিত আত্মবোধ যা বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ককে প্রশ্ন করে। আর্থ-সামাজিক, শ্রেণি-জাতিগত বাস্তবতা যে আত্ম পরিচিতি বোধ এবং সংযুক্তির বোধ তৈরি করে তার ভিত্তিতে নির্মিত হয় অভিজ্ঞতা। প্রান্তিক ছাত্রীদের

আর্থ-সামাজিক অবস্থান তাদের অভিজ্ঞতা নির্মাণ করে এবং অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে যা তাদের সাক্ষাৎকারের ভাষায় প্রতিফলিত। যা অন্যান্য ছাত্র এবং ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা এবং স্বতন্ত্র। পরিবারে তারা লিংগ বৈষমাই পেয়েছে, যেখানে পরিবারের পুরুষদের দ্বারা নির্যাতিত, অন্যদিকে তারা হস্টেল গণতান্ত্রিক পরিসর তারা পেয়েছে, সমর্থন পেয়েছে এবং সামনে এগিয়ে যাবার দিশা পেয়েছে হস্টেলে নিজেরা স্বশক্তিকরণ করতে পারছে, নবনির্মিত আত্ম বোধ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। পরিবার থেকে বাইরে এসে হস্টেলে তারা নিজেদের আবিস্কার করেছে। পরিসর দুটি তাদের ভিন্ন আত্ম-পরিচয়ের সঙ্গে তাদের ভিন্ন ভাবে অন্বিত করার অবকাশ তৈরি করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম "বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীদের ক্ষমতায়নের লড়াই, প্রান্তিক অবস্থান এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য" । প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক স্তর বিভাজন প্রসূত ক্ষমতা সম্পর্কের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী প্রান্তিক ছাত্রীদের আন্তঃসম্পর্ক এই অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু। অধ্যায়টি কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা পরিসর প্রান্তিক ছাত্রীদের ক্ষমতায়নে কিভাবে সদর্থক ভুমিকা নেয় বিশ্লেষিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের এগিয়ে যাবার দিশা দেখিয়েছে, নিজের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, আত্ম-সম্মান, আত্ম-মর্যাদা নির্মাণে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে। পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে, প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে সমস্যা। উচ্চশিক্ষা পরিসরে আত্ম -পরিচিতির সংকট, শিক্ষাক্ষেত্রে বিরতি নেবার কারণ, ভাষাগত সমস্যা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে জাতি, জাতিহীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার সমস্যা, বর্জনের নৈশঃব্দ এবং নীরবতা এবং আনুগত্যের রাজনীতি, মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা, 'উঁচু' এবং 'নীচু' সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সমস্যা, সাংস্কৃতিক মুলধনের অভাবজনিত সমস্যা আলোচিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হস্টেল এবং আবাসিকাদের সম্বন্ধে সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণ বিধৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মূলত হস্টেল কিভাবে প্রান্তিক ছাত্রীদের নিজস্ব পরিসর হয়ে ওঠে এবং নবনির্মিত আত্মবোধের আধার হয়ে ওঠে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, এই অধ্যায়ে হস্টেলের মধ্যে কিভাবে বৈষম্যপূর্ণ নিয়মাবলী অনুশীলন করা হয় এবং মেয়েদের হস্টেল সম্পর্কে সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণ আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য হল উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠান ও পরিসর হিসাবে বৈশিষ্ট্য, সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠান গুলিতে চর্চিত লিঙ্গ, জাতি ও আর্থসামাজিক বৈষম্যের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীদের অবস্থান। উচ্চশিক্ষা, হস্টেলে বসবাসের ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে প্রাপ্ত রিসোর্স তাদের জীবন গঠনে কিভাবে সদর্থক ভুমিকা নেয় পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেল পরিসরে কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক এবং কাঠামোগত ভাবে লিঙ্গ এবং জাতি বৈষম্যপূর্ণ নিয়মাবলী চর্চা করে থাকে আলোচিত হয়েছে। প্রথম প্রজন্মের ছাত্রীরা কিভাবে এই বৈষম্যের শিকার হয়, কারণ আর্থিক অবস্থা এবং দূরত্বের ভিত্তিতে দেওয়া হয় হস্টেল তারফলে বেশির ভাগ আবাসিক... পিছিয়ে পড়া শ্রেণির, প্রত্যেকে প্রথম প্রজন্মের না হলেও এলাকাগত দিক থেকে প্রান্তিক। মেস পিজিগুলো বৈষম্যমূলক নিয়ম দ্বারা চালিত হয়। এই নানাবিধ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে 'পিঞ্জড়া তোড়' আন্দোলন শুরু হয়েছে বিগত পাঁচ-ছয় বছর ধরে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রথম প্রজন্মের প্রান্তিক ছাত্রীরা কি ধরনের মনস্তাত্ত্বিক, মানসিক এবং

ব্যবহারিক অসুবিধা ভোগ করেন অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী অংশে বিশ্লেষিত হয়েছে প্রান্তিক ছাত্রীদের স্ব- প্রণোদিত ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও 'ভিতরের ক্ষমতা' কে জাগিয়ে তো তোলার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন আকার নেওয়ার প্রক্রিয়া। অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই অধ্যায়ে উচ্চশিক্ষা পরিসরে প্রান্তিক ছাত্রীদের প্রতিকুলতা এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায়নের অভিমুখে যাত্রায় আলোকপাত করা হয়েছে।

এই অধায়ের মূল যুক্তি পরম্পরা হল, প্রথমত, সংরক্ষণের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা পরিসরে প্রান্তিক ছাত্রীদের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি তাদের ফলপ্রসূ অংশগ্রহন এবং সক্রিয়তাকে স্বীকৃতি দেয় না। মধ্যবর্তী ব্যবধানের ধ্রুবক গুলি হল যে নঞর্থক অভিজ্ঞতার সম্মুখীণ তারা হন। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রান্তিক ছাত্রীর প্রান্তিকত্র চরিত্র বহুমাত্রিক। শ্রেণীগত, লিঙ্গগত, জাতিগত, ভৌগলিক – এই প্রান্তিকতা গুলি একক ভাবে যে প্রভাব তৈরি করে, দুটি বা সবগুলি একত্রিত ভাবে ভিন্ন প্রভাব তৈরি করে। প্রত্যেক প্রান্তিক ছাত্রীর অভিজ্ঞতা তাই ভিন্ন। লাইফ হিস্ট্রি রিসার্চ থেকে এই ব্যক্তি অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য উঠে আসে। তৃতীয়ত, যে জাতিগত পরিচিতি নিয়ে তারা আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেটা থেকে তাদের বেরোতে চায়। জাতিগত পরিচিতির থেকে তারা ছাত্র এবং গবেষক হিসাবে নিজেদের পরিচিতিকে গ্রহনে এবং উপস্থাপনে আগ্রহী। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার 'ক্ষমতা' রয়েছে। তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের সমর্থন সহ অথবা ছাড়াই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। তারা তাদের পরিবারের প্রথম প্রজন্ম যারা হস্টেলে থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রান্তিক শিক্ষার্থী হিসাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে তারপরও তারা জীবনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কঠিন জীবনযাপন করেছে এবং তার মধ্যে আলোচনা, তর্ক, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিরোধ দেখিয়েছে। সংরক্ষণ উচ্চশিক্ষায় তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে যাতে তারা তাদের স্বপ্নগুলো অর্জন করতে পারে তবে তাদের যাত্রাপথ সহজ ছিল না। তারা তাদের সমবয়সী সহপাঠীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র আগ্রাসী আচরণের মুখোমুখি হয়েছে সবকিছুর মধ্যে ক্রমে তারা নিজেদের দক্ষতার উন্নতি করেছে এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রসারিত করেছে। কিন্তু এখন ও এর ফলে/দ্বারা অর্থনৈতিক অবস্থা ও আয়ের উন্নতি হয়নি।

যাইহোক, তারা আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-মর্যাদা অর্জন করেছে কারণ তারা নিজেদের পুনরায় উদ্ভাবন করেছে, পুনর্নির্মাণ করেছে। এবং নিজেদের ক্ষমতায়নের জন্য সংগ্রামে হাল ছাড়তে চায় নি। তারা পরিবার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক নিয়ম এবং লিঙ্গগত শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে যা তাদেরকে বহু ক্ষেত্রে সীমায়িত করেছে, তাদের উপর অত্যাচার নেমে এসেছে এবং তাদের প্রান্তিক করেছে। তারা আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং তাদের তথাকথিত 'নিকৃষ্ট' এবং 'নিম্ন' সংস্কৃতি ও ভাষার জন্য লড়াই করার অধিকার প্রয়োগ করেছে। তারা উপলব্ধি করে যে, তারা একজন ছাত্র ও গবেষক হিসাবে তাদের পরিচয়কে অগ্রাধিকার দিতে চায়, এবং তাদের 'বর্ণ' পরিচয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বর্ণহীন' উচ্চবর্ণের সদস্যরা প্রান্তিক

শিক্ষার্থীদের এই লড়াই এর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। উচ্চবর্ণের শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন উপায়ে মনে করিয়ে দিয়েছে যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অনুপযুক্ত' এবং বিভিন্ন বিষয়ে 'অভাব' রয়েছে তাদের, এর ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের 'অপর' হিসাবে বিবেচনা করার এবং বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রবণতা বহাল থেকেছে।

এইভাবে, তাদের মধ্যে 'অন্তর্গত শক্তি' বিদ্যমান কাঠামো এবং নিয়মগুলি সনাক্ত করতে এবং প্রতিফলিত করতে সহায়তা করেছে যার ফলে তারা ক্ষমতায়নের কঠিন পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের ব্যক্তিগত চেতনা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। তবে, তারা যা করতে পারেনি তা হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাঠামো পরিবর্তনের জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপে জড়িত হওয়ার জন্য, সে বিষয়ে সক্ষম হওয়ার জন্য অন্যান্য মহিলাদের সাথে সংযোগ স্থাপন ও ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে, এবং 'ক্ষমতার সাথে' প্রক্রিয়াকে সক্ষম করে তুলতে। এইভাবে, যদিও তারা পৃথক পৃথক যুদ্ধে সামিল হয়েছে এবং ব্যক্তিগত জীবনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের 'ভিতরের শক্তিকে' স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা অন্য মহিলাদের সাথে অন্যায় ও বৈষম্য মোকাবেলায় 'শক্তি' প্রয়োগ করতে এখনও সামিল হতে পারে নি, মূলত যে প্রক্রিয়াটির মধ্যে রয়েছে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের 'শক্তি'। তাদের লড়াইগুলি ব্যক্তিগত লড়াই হিসাবে রয়ে গেছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থানে দুর্বলতা ও অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূলধনের অভাব তাদের কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য লড়াই করতে সক্ষম করে তুলতে পারে নি। কিন্তু তারা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে সমর্থন পেয়েছে যা উত্তর-পূর্বের উপজাতি সম্প্রদায় বা সাঁওতাল সম্প্রদায় ইত্যাদি। যদিও কোনো বড় ধরনের গোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি, কিন্তু জরুরি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আর ও স্থায়ী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করতে হলে আরও অনেক কিছুর সম্মিলন দরকার।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম "হস্টেলজীবন কেন্দ্রিক বাংলা কথা- সাহিত্যে আবাসিক ছাত্রীর উপস্থাপন : একটি আন্তঃ স্তরবিন্যাস ভিত্তিক পাঠ" । এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে আবাসজীবনের ধারাবাহিক উপস্থাপনা ও হস্টেলজীবন কেন্দ্রিক সাহিত্য। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, বাংলা কথা সাহিত্যে নতুন একটি প্রবণতা ধীরে ধীরে পরিলক্ষিত হচ্ছে, একটি নতুন সংরূপ – হস্টেল জীবন কেন্দ্রিক সাহিত্যে নির্মিত হয়ে চলেছে – প্রেক্ষাপট সহ একটি স্বতন্ত্র গোত্র প্রস্তাবিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখা দিচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসজীবন। হস্টেল জীবন সম্বন্ধে রচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে উপন্যাস, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা। আবাসিক নারী আন্তঃস্তরবিন্যাসের ভিত্তিতে কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে – এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য। দ্বিতীয় অংশে বিশ্লেষিত হয়েছে বিশ্বভারতীর প্রথম মেয়েদের হস্টেল শ্রীসদনের 'উচ্চবিত্ত' আবাসিকারর দুটি স্মৃতিকথা। শান্তিনিকেতনের সূচনাকালে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে আবাসজীবন যাপন করেছিলেন রাণী চন্দ, রমা চক্রবর্তী প্রমুখ। তাঁদের শ্রীসদনে আবাসজীবনের স্মৃতিকথা বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হস্টেল জীবন, নারী ও পুরুষ আবাসিকের উপস্থাপনের তারতম্য, সমাজের বিভিন্ন অবস্থানের নারীর আবাসজীবনের

অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন, কিভাবে সামাজিক অবস্থান অনুসারে বদলে যায় স্মৃতিকথার বয়ান। কথা সাহিত্যের মূলত দুটি শাখা উপন্যাস এবং স্মৃতিকথায় উপস্থাপিত মেয়েদের আবাসজীবন সমসাময়িক দুটি উপন্যাস এবং দুটি স্মৃতিকথা অবলম্বনে আলোচিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে প্রান্তিক নারীর অংশগ্রহণের সমান্তরালে আবাসজীবন কেন্দ্রিক কথা সাহিত্যে প্রান্তিক নারীর স্বরের নৈঃশব্দ এবং সমাজের ভিন্ন অবস্থানের নারীদের দ্বারা প্রান্তিক নারীর উপস্থাপন এই অধ্যায়ের মূখ্য বিষয়।

এই অধ্যায়ের মূল যুক্তি ক্রম হল, একদিকে উচ্চশিক্ষা জগতে প্রান্তিক ছাত্রীদের আগমন যেমন সংরক্ষণ সত্বেও সীমিত, অন্যদিকে সাহিত্যেও দেখা যাচ্ছে এই স্বরের অভাব। তারা উচ্চশিক্ষা থেকে লব্ধ নবনির্মিত আত্মবোধ নিয়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছে কম যার ফলে যেমন চাকরিতে যুক্ত হয়ে অর্থনীতিতে অংশ নিতে পারছে না অন্য দিকে তাদের স্মৃতিকথাও সাহিত্যে আসছে না। তারা উপস্থাপিত হচ্ছেন অন্যের লেখনিতে। ছাত্রী, গবেষক, এবং একজন স্বতন্ত্র নারী হিসাবে নিজেদের সত্তা বা পরিচিতির অংশ যেমন রক্ষা করে এগিয়ে যাবার পথে একটা সময় থেমে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, তেমনি লেখক সত্তাটিকেও তারা ধারণ করার অবকাশ পাচ্ছেন না। অথবা সাংস্কৃতিক মুলধনের অভাবে, গ্রহণযোগ্যতার অভাবে তাদের শিক্ষাজীবনের, আবাসজীবনের অভিজ্ঞতা আড়ালে থেকে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার মতই সাহিত্যে, স্মৃতিকথায় তাদের স্বরের শূন্যতা লক্ষ করার মত।

উপসংহারে এই গবেষণা সম্পর্কে সামগ্রিক যুক্তিপরম্পরা, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন সংকট, পলিশি নির্মাণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ, গবেষণার ত্রুটি বিচ্যুতি এবং পরবর্তী সম্ভবনা উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে সংযোজিত হয়েছে **সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি।**

“Be your own policy maker.” দেওয়াল লিখন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীণ ছবি, ২০২২, নিজস্ব চিত্র।

গ্রন্থপঞ্জি

চক্রবর্তী, রমা, (১৪০৮), ভরা থাক স্মৃতিসুধায়, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

চন্দ, রানী, (১৪০১), সব হতে আপন, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন।

নিয়োগী, বানী, (২০০১), শ্রীসদনের ইতিকথা, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

বসু, ঋতা, (২০১৬), শ্রীসদনের শ্রীমতীরা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বিশ্বাস, অহনা, (২০০০) অহনা বিচিত্রা, আরশি নগরে তাঁবু, প্রথম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা (পৃষ্ঠা ৩- ১১২)

বিশ্বাস, অহনা, (২০০৯), মেয়েদের হস্টেল-জীবন অন্দরের কথামালা, গাঙচিল, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, অমিত, (২০২৩), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসে ও ব্যক্তিদর্পণে (১৯০৬-২০১৭), সেতু পাবলিকেশন, কলকাতা।

মজুমদার, তিলোত্তমা, (২০০৩), চাঁদের গায়ে চাঁদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সেন, অমিতা, (১৯৭৭), শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কলকাতা।

Batliwala, S. (1993). Empowerment of Women in South Asia: Concepts and Practices. Asian-South Pacific Bureau of Adult Education.

Batliwala, S. (2019). All about Power: Understanding Social Power and Power Structure. Crea.

Belluigi, D. Z. (2020). Lecture: The Challenges Facing Social Justice in and of Higher Education. Jadavpur University.

Belluigi, D. Z., Thondhlana, G. (2020). Your Skin has to be Elastic: The Politics of Belonging as a Selected Black Academic at a 'Transforming' South African University. International Journal of Qualitative Studies in Education, 35(2),141-162, doi:10.1080/09518398.2020.1783469.

Choudhury, S. (2011). What is to be done? Economies of knowledge. Sage, 105(1), 7-22. https://doi.org/10.1177/0725513611400392.Corbridge.

Davis, N. Y. (2006). Belonging and the Politics of Belonging: Patterns of Prejudice. Routledge, 40(3),197-214.

Davis, N. Y. (2011). The Politics of Belonging: Intersectional contestations. Sage.

Deshpande, S. (2013). Caste and Castelessness: Towards a Biography of the 'General category'. Economic and Political Weekly, 48(15), 32–39.

Dhawan, N B., Belluigi, D. Z., Idahosa, G. EO. (2023). “There is a hell and heaven difference among faculties who are from quota and those who are non-quota”: Under the Veneer of the 'New Middle Class' Production of Indian Public Universities. Higher Education, 86, 271-296. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00932-7

Foucault, M. (translated by Alan Sheridan). (1975). Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Penguin Books.

Ghosh, A. (2017). Thought, Policies and Politics: How May we Imagine the Public University in India? Kronos, 43(1). doi.org/10.17159/2309-9585/2017/v43a11

Goffman, E. (1961). Asylums: Essays on the Situations of Mental Patients and Other Inmates.

Guru, G. (Oct,1995). Dalit Women Talk Differently. Economic & Political Weekly, 30(41/42),2548 -2550.

John, M. (August, 2015). Intersectionality: Rejection or Critical Dialogue? Economic & Political Weekly, 50(33),72-76

John, M. E. (2012). Gender and higher education in the time of reforms. Contemporary Education Dialogue, 9(2), 197–221.

Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. Blackwell.

Kabeer, N. (2001). Conflicts over credit: Re-evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh. World Development, 29(1), 63-84.

Nair, J. (2017). The Provocations of the Public University. Economic and Political Weekly, 52(37), 34-41.

Nash, C, J. (2008) Re-thinking Intersectionality. Feminist Review, 89(1),1-15. https://doi.org/10.1057/fr.2008.

Paik, S. (2014). Dalit women’s education in modern India: Double discrimination. Routledge.

Rege, S. (1998). Dalit Women Talk Differently; A Critique of 'Difference' and Towards a Dalit Feminist Standpoint Position. Economic & Political Weekly, 33(44), WS39-WS46.

Rege, S. (2006). Writing Caste/Writing Gender: Reading Dalit Women's Testimonios. Zubaan.

Rowlands, J. (1997). Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras. Oxford.

Scott, S. (2011). Total Institutions and Re-Inventive Identities. Palgrave Macmillan.

Scott, S. (2011). Total institutions and re-inventive identities. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Shreeya, A. (2018). The Self as an Active Agent: Understanding Goffman's Theory of Resistance in Total Institutions through Life histories. Sage.

Shreeya, A. (2018). The self as an Active Agent: Understanding Goffman's Theory of Resistance in Total Institutions through Life histories. Sage.